বুলেটিন নং ঃ ১০
প্রকাশ কাল ঃ ১২ এপ্রিল '৯৯
শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৫ টাকা

স্বাধিকার

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট -এর মুখপত্র

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

দেশে বাড়ছে দুর্গতি, প্রধানমন্ত্রীর জুটছে পুরষ্কার-ডিগ্রি

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

দেশের অবস্থা ভালো যাচ্ছে তা আজ কেউই বলতে পারছে না। সরকারের পদস্থ আমলা, মন্ত্রী এমনকি খোদ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেও এটা প্রমাণ করা সম্ভব হবে না যে, দেশের অবস্থার উন্নতি ঘটছে। আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থার চরম অবনতির কারণে সাম্প্রতিককালে মেজর রফিকুল ইসলামকে (অবঃ) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তার জায়গায় ডাক ও তার মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার অর্পন করা হয়েছে। মন্ত্রীপরিষদে এ ধরনের বড় রদ বদল দেশে নাজুক পরিস্থিতিরই সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। কুষ্টিয়ায় প্রকাশ্য দিবালোকে জনসভায় জাসদ কেন্দ্রীয় নেতা কাজী আরেফসহ ১০ জনকে খুন করা, যশোহরে উদিচী শিল্পী গোষ্ঠির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বহু সংখ্যক সাংস্কৃতিক কর্মী ও সাধারণ দর্শককে হত্যা, ইতিপূর্বে কবি শামসুর রাহমানের প্রাণনাশের চেষ্টা, সিলেটে বোমা তৈরী করতে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটে খোদ সরকারী দলের এমপি'র বাড়ীতে দু'জনের মৃত্যু, হরতাল বিরোধী মিছিলের নামে প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের কাছ থেকে শর্টগান কেড়ে নিয়ে একজন সরকারী এম.পি'র বিরোধীদলীয় কর্মীদের উপর হামলা, ঢাকায় লোক খুন করে গোয়েন্দা সংস্থার সদর দপ্তর ডিবি অফিসের পানির ট্যাঙ্কে লুকিয়ে রাখা, ডিবি'র লোকজন কর্তৃক বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে ইন্ডিপেন্ডেট ইউনিভার্সিটির ছাত্র রুবেলকে হত্যা, আদালতের মতো জায়গায় শিশু তানিয়াকে পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণ, থানায় এজাহার দিতে গিয়ে ব্রিটিশ নাগরিককে পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের নেতা কর্মী ও মস্তানদের ছাত্রী ধর্ষণ ... ... এ ধরনের চাঞ্চল্যকর লোমহর্ষক ঘটনা পুরোপুরি তুলে ধরতে গেলে এই তালিকা আরো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে। প্রতিদিনকার পত্রিকার পাতা খুললে খুন, ধর্ষণ, গুম আর ছিনতাইয়ের ঘটনা তো আছেই। এসব দেশে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ধরনের খরবগুলো যেন মানুষের গা সওয়া হয়ে যাচ্ছে ! কেবল বড় কোন চাঞ্চল্যকর ঘটনাই মানুষকে নাড়া দেয় মাত্র। জনতার রোষ থামাতে সরকার বাহ্যিকভাবে লোকদেখানো কিছু পদক্ষেপও নেয়। গণ অসন্তোষ যাতে প্রতিবাদ বিক্ষোভে বিস্ফোরিত হয়ে ক্ষমতার ভিত নাড়িয়ে দিতে না পারে সেজন্য সরকার কত কিছুই না করে থাকে ! কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। মন্ত্রীসভায় রদবদলও হচ্ছে লোকদেখানোর সরকারী ধাপ্পাবাজী। এতে ক্ষণিকের জন্য সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা গেলেও, শেষ পর্যন্ত আসল কেরামতি ধরে ফেলতে জনতা ভুল করবে না।

সারা দেশের অবস্থা খারাপ। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র চাল-ডাল-তেলের দাম ধরা ছোঁয়ার বাইরে, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, নাগরিক জীবনের অপরিহার্য বিদ্যুত, গ্যাস ও পানির তীব্র সংকট, চোরাকারবারী, দুর্নীতি, সবক্ষেত্রে দলীয়করণ, বেকার সমস্যার প্রকট আকার ধারণ, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া ও শ্রমিকদের বেতন-ভাতা-বোনাস মিটিয়ে না দেয়ায় এই সংকট দিন দিন তীব্রতর হচ্ছে। অন্যদিকে অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারের ব্যয় বেড়েই চলেছে। দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের জন্য কল কারখানা স্থাপন না করে সামরিক খাতে অব্যাহতভাবে ব্যয় বাড়ানো হচ্ছে। দরিদ্র দেশে প্রতি মৌসুমে ব্যয় বহুল সামরিক মহড়ার আয়োজন, জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ প্রতিষ্ঠা, সেনা সদস্যদেরকে নামমাত্র মূল্যে রেশন সরবরাহ, সেনা অফিসারদেরকে অন্যায় সুযোগ-সুবিধা প্রদান, সামরিক মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন আরো কতোভাবে যে সরকার সেনাবাহিনীর মনতুষ্টির জন্য মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা রীতিমতো উদ্বেগজনক; লজ্জাজনক তো বটেই। অথচ, শিক্ষাখাতে সরকারের ব্যয় অত্যন্ত নগণ্য। দেশের অধিকাংশ স্কুল কলেজগুলোতে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নেই। বিশ্ব বিদ্যালয়গুলোতে হলের খাবার অত্যন্ত নিম্নমানের। গবেষণা ও অধ্যয়নের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা নেই। দেশের শিক্ষার ভবিষ্যত এক কথায় অন্ধকার। সামাজিক অবক্ষয়, অপসংস্কৃতির আগ্রাসন দেশের যুব সমাজকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে।

দেশের এ ধরনের নাজুক পরিস্থিতি বিরাজ করা সত্ত্বেও, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ পর্যন্ত চার চারটি ডিগ্রি ছিনিয়ে এনে সাংঘাতিক রকমের কৃতিত্ব দেখিয়ে

(২য় পাতায় দেখুন)

বৈসাবি উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বস্তরের জনগণের প্রতি ইউপিডিএফ-এর প্রাণঢালা শুভেচ্ছা

সরকার জনসংহতি সমিতিকে ঠকিয়েছে

-আ.ফ.ম. মাহবুবুল হক

[সাবেক ছাত্রনেতা, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের আহ্বায়ক, বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশিষ্ট যোদ্ধা আ. ফ. ম. মাহবুবুল হক দেশের জাতীয় দৈনিক মাতৃভূমির সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে দেশের চলমান পরিস্থিতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে মতামত দেন। ১লা এপ্রিল ১৯৯৯ প্রকাশিত উক্ত সাক্ষাতকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত অংশটি আমরা হুবহু প্রকাশ করলাম - সম্পাদক]

মাতৃভূমি ঃ সম্প্রতি জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আপনাদের বৈঠক হয়েছে?

আ.ফ.ম. মাহবুবুল হক : হ্যাঁ হয়েছে।

মাতৃভূমি ঃ জনসংহতি সমিতি বামফ্রন্টের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি বাস্তাবায়নের ব্যাপারে সহযোগিতা চেয়েছে। বাম ফ্রন্ট জনসংহতি সমিতিকে কি ধরনের আশ্বাস দিয়েছে?

আ.ফ.ম. মাহবুবুল হক : জনসংহতি সমিতির সঙ্গে রাশেদ খান মেননের বাসায় বাম ফ্রন্ট বৈঠক করেছে। বৈঠকে আমরা পার্বত্য চুক্তির বিভিন্ন জটিলতা নিয়ে আলোচনা করেছি।

মাতৃভূমি : আপনি জটিলতার কথা বলছেন। কি ধরনের জটিলতা, বলবেন কি?

আ.ফ.ম. মাহবুবুল হক : আমরা তিনটি জটিলতার কথা বলেছি। এক. পার্বত্য এলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলোর কোনো সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই।

দুই. ভারত থেকে আসা উদ্বাস্তুদের কিভাবে পুনর্বাসন করা হবে, তার কোন কথা চুক্তিতে নেই।

তিন. পাহাড়ী-অপাহাড়ীদের ভূমি বন্টন সংক্রান্ত কোনো দিক নির্দেশনা চুক্তিতে নেই।

মাতৃভূমি : তাহলে এটা কি জনসংহতি সমিতির ব্যর্থতা বা অপারগতা নয় যে, তারা চুক্তি করলো অথচ দাবি আদায় করতে পারলো না।

আ.ফ.ম. মাহবুবুল হক : আসলে হয়েছে কি, জনসংহতি সমিতি চুক্তিটা ভালোভাবে বোঝা বা উপলব্ধি করার আগেই চুক্তিতে উপনীত হয়েছে। তবে আমরা মনে করি, বাংলাদেশের সব গণতান্ত্রিক মানুষের দায়িত্ব রয়েছে এ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসার।

মাতৃভূমি : তাহলে আপনি কি মনে করেন, আওয়ামী লীগ সরকার জনসংহতি সমিতিকে ঠকিয়েছে।

আ.ফ.ম. মাহবুবুল হক : অবশ্যই। আওয়ামী লীগ স্টান্টবাজী করেছে। তারা সামগ্রিক সমস্যার সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

মাতৃভূমি : এই বৈঠকের উদ্যোক্তা কারা ছিল?

আ.ফ.ম. মাহবুবুল হক : বৈঠকটা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমেই হয়েছে।

নানিয়ারচর জোনে সেনা সম্মেলন

গাঁজা অবৈধ হলেও লাভজনক !

নানিয়ারচর সেনা জোনের অধীনস্থ অফিসার ও জওয়ানদের নিয়ে ২০ মার্চ এক সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। সূত্রটি জানিয়েছে সম্মেলনে আগত অফিসাররা এমন মত দিয়েছে যে, প্রতি মাসে অথবা পনের দিন অন্তর নানিয়াচরের পশ্চিমের পাহাড়গুলোতে সেনা অভিযান চালিয়ে এলাকায় আগের মতো সেনা প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের দু'একটা অঞ্চলের মধ্যে এখানেও গাঁজা জন্মায়। এখানে লোকজনের উপার্জন হয় গাঁজা বিক্রি করে, তবে কেউই এলাকায় গাঁজা সেবন করে না। গাঁজা ধ্বংসের উছিলায় সেনা অভিযান চালালে জনগণ ও প্রশাসনের উপর সেনাবাহিনী কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হবে বলে সম্মেলনে দু'একজন অফিসার মত প্রকাশ করেন বলে সূত্রটি জানিয়েছে।

একজন সেনা অফিসার এমনও মন্তব্য করেন যে, গাঁজা অবৈধ হলেও, লাভজনক। প্রতিটি সেনা ক্যাম্পে গাঁজা চাষ করে জওয়ানদেরকে গাঁজা চিনিয়ে দেয়া উচিত বলে অফিসারটি মন্তব্য করেন।

গাঁজা তথা সকল ধরনের মাদকদ্রব্য ধ্বংস ও নিষিদ্ধ করতে সেনাবাহিনী যদি আন্তরিকভাবে ভূমিকা রাখতো, তাহলে তা জন সাধারণের সমর্থন ও সাধুবাদ নিঃসন্দেহে লাভ করতো। কিন্তু, এ যাবৎ সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে যা করেছে, তাতে গাঁজা ধ্বংসের সেনা পণ-প্রতিজ্ঞা একটা ধাপ্পাবাজি মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের যুব সমাজকে নেশাগ্রস্থ করে রসাতলে নেবার জন্যই তো সেনাবাহিনী মদ-জুয়া-গাঁজা-ফেনসিডিল-হিরোইন ইত্যাদি ছড়িয়ে দিয়েছে। যুব সমাজকে নেশাগ্রস্থ করে স্পাইগিরির কাজে লাগাতে চেয়েছে। খাগড়াছড়ির সীমান্তবর্তী থানা পানছড়িতে এক সময় পুলিশের হাতে দু'জন ফেনসিডিল চোরাকারবারী ধরা পড়লে, পানছড়ির সেনা অধিনায়ক তাদেরকে সেনাবাহিনীর লোক পরিচয় দিয়ে থানা থেকে ছাড়িয়ে নেয়। রাঙ্গামাটি সদরসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় সেনাবাহিনী অনুদান দিয়ে পাড়া-মহল্লায় ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে যুব সমাজকে মদ-জুয়া-গাঁজা-ফেনসিডিল-হিরোইন খাইয়ে বিপথে পরিচালিত করার সর্বত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা সদরে প্রকাশ্য দিবালোকে যে সমস্ত ক্লাব আস্তানাগুলোতে গাঁজা-ফেনসিডিল ও জুয়ার আসর বসে, তাদের ব্যাপারে সেনাবাহিনী ভীষণ রকমের নিরব। গাঁজা-ফেনসিডিলে আসক্ত হয়ে সমাজের যে সমস্ত বখাটে ছেলে জনসংহতি সমিতির প্ররোচনায় দুই নাম্বারী সংগঠন করে খুন-সন্ত্রাস করছে, তাদেরকে সেনাবাহিনী আশ্রয় প্রশ্রয় দেয়। মুখোশ বাহিনী সৃষ্টি করে দিয়ে PGP-PCP-HWF ' কে জব্দ করতে সেনাবাহিনী তথাকথিত কাউন্টার ইন্সার্জেন্সী পলিশি গ্রহণ করেছিলো। বর্তমানে জনসংহতি সমিতি ও দুই নাম্বারীদের দিয়ে সেনাবাহিনী একই উদ্দেশ্য হাসিল করে নিচ্ছে।

কাজেই গাঁজা অবৈধ হলেও সেনাবাহিনীর জন্য লাভজনক তো বটেই ! গাঁজা ধ্বংসের উছিলায় পাহাড়ীদের পাড়া-গ্রামগুলোতে অপারেশন চালাতে সুবিধে হয়। গাঁজা ক্যাম্পে নিয়ে এসে ক্লাবগুলোতে বিতরণ করে দিয়ে নতুন নতুন গাঁজা খোর সৃষ্টি করা যায়। আন্দোলন সংগ্রাম থেকে যুব সমাজকে দূরে সরিয়ে রাখতে হলে দরকার গাঁজা-ফেনসিডিল। গাঁজার মেলা সুবিধা !!! সেনা অফিসারটির ভাষায় যথার্থই গাঁজা অবৈধ হলেও,লাভজনক !!! প্রতিটি সেনা ক্যাম্পে গাঁজা চারা লাগানো হোক ! গাঁজা চাষের জন্য বিশেষভাবে লোক নিয়োগ দেয়া হোক ! বড় সেনা ছাউনীগুলোতে ফেনসিডিলের ফ্যাক্টরীও স্থাপন করা হোক। অবাধে গাঁজা-ফেনসিডিল-হিরোইন সেবনে সহায়তা দেবার জন্য সেনা টহলের ব্যবস্থা করা হোক। পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটি দরকার, পাহাড়ীদের দরকার নেই।

"উপাজাতিরা" গাঁজা-ফেনসিডিল-হিরোইন সেবন করে, জুয়া খেলে, দুই নাম্বারী সংগঠন করে নিজেরা নিজেরা মারামারি করে শেষ হয়ে যাক। সেনাবাহিনীর নীল নক্সা বাস্তাবায়ন করতে এখন তো জনসংহতি সমিতিও শরীক হয়েছে। জয়তু গাঁজা-ফেনসিডিল-হিরোইন ! জয়তু জুয়া-ডাব্বুয়া-যাত্রা-তামাশা !! ❑

স্বাধিকার
১২ এপ্রিল '৯৯ ॥ বুলেটিন নং : ১০

সম্পাদকীয়

বৈসাবি শুভেচ্ছা

বছর ঘুরে আবার আমাদের মাঝে মহান ঐতিহ্যবাহী উৎসব বৈসাবি (বৈসু-সাংগ্রাই-বিঝু) সমুপস্থিত। এ উপলক্ষ্যে সম্পাদকমন্ডলী স্বাধিকারের পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি বৈসাবি'র প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

চৈত্রের প্রচন্ড তাপদাহের সমতালে দেশের ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। নিঃস্ব খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। "পার্বত্য চুক্তি" তাদের জন্য নতুন কিছু বয়ে আনেনি। আশা জাগানোর মতো কোন কিছুই চুক্তিতে নেই। অত্যাচার উৎপীড়ন আর দৈন্যদশায় জর্জড়িত মানুষের জন্য চুক্তিটি অভিশাপের মতো হয়ে আছে।

পুরাতন বছরের বিদায় আর নতুন বছরের আগমনলগ্নে বৈসাবি উৎসব পার্বত্য চট্টগ্রামের জনজীবনে তথা গোটা দেশে কিছুটা হলেও আনন্দ বয়ে আনুক আমরা সেটাই প্রত্যাশা করি। পুরাতন বছরের সমস্ত ব্যর্থতা আর দ্বিধাদ্বন্দ্বের আত্মঘাতি বিভ্রান্তি ও অনৈক্যের জঞ্জাল আবর্জনার মতো পুড়ে ফেলে সম্মুখ পানে লড়াই সংগ্রামের পথে নব উদ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। বিগত দিনের নিষ্ফল ব্যর্থ আন্দোলনের অবশেষকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পথ চলতে হবে নতুন অগ্নি মশাল উর্ধ্বে তুলে ধরে। ইউনাইটেড পিপলস্ ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বৈসাবি উৎসবের প্রাক্কালে তাই জনগণকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি অনাগত দিনগুলোতে ভয়ভীতিহীন মুক্ত পরিবেশে সার্থকভাবে উৎসব করতে পারার লক্ষ্যে ইউপিডিএফ এর নেতৃত্বে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত হতে আমরা সবাইকে আহ্বান জানাই।

বৈসাবি উৎসবের প্রাক্কালে আমরা গভীর দুঃখ ও বেদনার সাথে আমাদের শহীদ সহযোদ্ধাদের স্মরণ করছি। যারা কারাগারে অন্তরীণ রয়েছেন তাদের কথাও স্মরণ করছি। ৪ঠা এপ্রিল '৯৮ পানছড়িতে সন্ত্র চক্রের হাতে আমাদের প্রিয় সহযোদ্ধা কুসুম প্রিয় ও প্রদীপ লাল অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে খুন হয়েছিলেন। এবছর ৩ ফেব্রুয়ারী মাইসছড়িতে কসাই সন্ত্র'র লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসী গুন্ডাদের হাতে হরেন্দ্র ও হুরুক্ষ্যা প্রাণ হারিয়েছেন। ৮ ফেব্রুয়ারী দীঘিনালায় অনুরূপভাবে সন্ত্র চক্রের পান্ডাদের হাতে নিহত হয়েছেন আনন্দময় ও মৃনাল। তার আগে খুন হয়েছিলেন দীঘিনালায় বীর লাল কার্বারী।

চৈত্র-এপ্রিল পার্বত্য চট্টগ্রামের জনজীবনে মিশ্র অনুভূতির মাস। ১০ এপ্রিল '৯২ সংঘটিত হয়েছে স্মরণাতীত কালের ভয়াবহ লোগাং হত্যাযজ্ঞ, ৪ এপ্রিল '৯৮ খুনী সন্ত্র চক্রের হাতে শহীদ হয়েছে কুসুমপ্রিয় ও প্রদীপ লাল, '৯৭ সালের ফুল বিঝুতে মাইসছড়িতে সুপরিকল্পিতভাবে দাঙ্গা বাধিয়ে বৈসাবি উৎসব পন্ড করা হয়েছিলো. এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়টা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মহান উৎসব বৈসাবি আর ২৮ এপ্রিল '৯২ পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলন সংগ্রামে অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক লোগাং লংমার্চ পরিচালিত হয়েছে। চৈত্র-এপ্রিল মাসটি তাই আমাদের জীবনে একদিকে উৎসবের বার্তা নিয়ে আসে এবং অন্যদিকে ভয়াবহ লোগাং হত্যাযজ্ঞে নিহত শহীদ আর আমাদের সংগ্রামী শহীদ সহযোদ্ধাদের স্মরণে আমাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত করে তোলে।

বৈসাবি উৎসবের লগ্নে তাই আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে কেবল আনন্দ উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে তথাকথিত পার্বত্য চুক্তির গুনকীর্ত্তণে সরকারকে লাভবান না করার অনুরোধ জানাই। নিজেদের সামর্থ্যের বাইরে অহেতুক লোকদেখানো কৃত্রিম জৌলুস প্রদর্শন ও বিলাসিতা না করে ভবিষ্যতের কথা স্মরণে রেখে আন্দোলন সংগ্রামে সামিল হবার আহ্বান জানাই।

স্বাধিকার এ সংখ্যা হতে ইউপিডিএফ-এর মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হলো। বুলেটিন প্রতিমাসে নিয়মিত বের করার জোর প্রচেষ্টা চল্‌ছে। এক্ষেত্রে আমরা পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক সহায়তা প্রার্থী। দ্রুত তথ্য ও লেখা পাঠিয়ে স্বাধিকার প্রকাশনা নিয়মিত করতে এগিয়ে আসুন। স্বাধিকার পার্বত্য চট্টগ্রামের তথা নির্যাতিত জনতার অব্যক্ত কথাগুলো তুলে ধরতে সদা সচেষ্ট থাকবে।

প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠি, সন্ত্রাসী পান্ডা, অধঃপতিত জনসংহতি সমিতি ও অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠি কারোর ভ্রূকুটিকে পরোয়া না করে স্বাধিকার জনগণের দাবী নির্ভীক চিত্তে তুলে ধরবে। নির্যাতিত জনতার সমর্থন সহযোগীতা ও অনুপ্রেরণাই আমাদের পাথেয়।

(১ম পাতার পর)

দেশে বাড়ছে দুর্গতি

চলেছেন !! প্রথমে আমেরিকার বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়, পরে জাপানের এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, তারপরে স্কটল্যাণ্ডের আরো এক বিশ্ববিদ্যালয় হতে এবং কিছুদিন আগে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও দেশিকোত্তমের মতো একটা বড় সড় ডিগ্রি কামাই করে ফেলেছেন ! এই অতি সাম্প্রতিক কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা "১৯৯৮ সালের ইউনেস্কো হুফে বোয়ানি শান্তি পুরস্কারের" জন্য মনোনীত হয়েছেন বলে পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে। বিতর্কীত ব্যক্তিত্ব সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে একটি আন্তর্জাতিক জুরি ঐ ঘোষণা দিয়েছে সে খবরও পত্রিকায় এসেছে। দুনিয়ায় এ কি লীলা খেলা ! প্রধানমন্ত্রী হাসিনার জন্য আরো কত কি ডিগ্রি পুরস্কার অপেক্ষা করছে তা ইশ্বরই একমাত্র জানেন। বিধাতা প্রধানমন্ত্রীর মঙ্গল করুন। তাকে দীর্ঘজীবী করুন। তাকে আরো বেশী বেশী করে ডিগ্রি পুরস্কার অর্জনের মেধা প্রতিভা দিন। দেশ-জনতা চুলায় যায়, যাগ্ গা! প্রধামন্ত্রী, আওয়ামী লীগ ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা ক্ষমতায় থাকতে পারলেই হলো। জনগণের সুযোগ সুবিধা দেখার কোন প্রয়োজন নেই !

প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে "ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কারের" জন্য মনোনীত করায় মহল বিশেষের পক্ষ থেকে অভিনন্দনের ঝড় এখনো বয়ে যাচ্ছে। বুঝতে কারোরই অসুবিধা হবার কথা নয়, কি মতলবের বশবর্তী হয়ে এসব অভিনন্দন বর্ষিত হচ্ছে। যে হেনরী কিসিঞ্জার এক সময় বাংলাদেশকে "তলাবিহীন ঝুড়ি" (bottomless busket) আখ্যা দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিলেন, তিনিই এখন আন্তর্জাতিক জুরিতে (তৃতীয় বিশ্বকে ধোঁকা দেয়ার ঝুড়ি?) সভাপতিত্ব করে প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেন ! এ বড় নির্মম রসিকতা !!

এ এক লীলা খেলা !!!

পার্বত্য চট্টগ্রামে কি এমন যুগান্তরী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যে, যার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে '৯৮ সালের ইউনেস্কো হুফে বোয়ানি শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা জরুরী হয়ে পড়েছে !! যে জন সংহতি সমিতির সাথে সরকারের চুক্তি হয়েছে, তারাই এখন বলতে বাধ্য হচ্ছে "পার্বত্য চট্টগ্রামে সব কিছুই আগের মতো রয়েছে।" পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জন্য আত্মঘাতি পার্বত্য চুক্তির মধ্য দিয়ে গঠিত আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা নিতে জনসংহতি সমিতিকে পর্যন্ত মেনে না নেয়ার অভিনয় করতে হচ্ছে। পার্বত্য চুক্তি কতখানি ফাঁপা এবং জনগণের জন্য আত্মঘাতি—তা সবার কাছে দিবালোকের মতো পরিষ্কার বলেই তো জন সংহতি সমিতিকে জনতার রুদ্র রোষের ভয়ে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা গ্রহণ করতে লোকদেখানো গড়িমসি করতে হচ্ছে। যদিও আঞ্চলিক পরিষদ মেনে নেয়া ছাড়া তাদের আর কোন গতি নেই, তাদেরকে আঞ্চলিক পরিষদ মেনে নিয়েই আওয়ামী সরকারের অনুগত থেকে কৃপা ভিক্ষে করে থাকতে হবে। রাজনৈতিক যাত্রা মনস্থ করতে তারা এখন আঞ্চলিক পরিষদ মেনে নেবার ব্যাপারে জনমত জরিপ চালানোর কথা বলছে। নিলর্জ্জ বেলেল্লাপনা আর কাকে বলে ! ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে মনোনীত করার ব্যাপারে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ডের কি পর্যাপ্ত ধারণা-জ্ঞান আছে? কাদের উদ্দেশ্য ও স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে এ ধরনের শান্তি পুরস্কার দেয়া হচ্ছে? ইসরায়েলের খুনী মেনা হেইম বেগিনও (যাকে মেনাসেইম বেজিন ও ডাকা হয়) তো শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন। বিশ্বের আরো অনেক বিতর্কীত ব্যক্তি খুনী শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। তাতে কিন্তু যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলোতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আসল পরিস্থিতিকে ধামাচাপা দিয়ে সম্পদশালী অঞ্চলগুলোর সম্পদ হাতিয়ে নেবার দুরভিসন্ধি থেকেই উপনিবেশিক শাসকবর্গ সুকৌশলে তৃতীয় বিশ্বের নেতা নেত্রীদেরকে নানান ডিগ্রি ও পুরস্কার ভূষিত করে থাকে। আগেকার দিনে সৈন্য সামন্ত নিয়ে দেশ দখল করে নিজেদের দেশে সম্পদ নিয়ে যেতো। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। কাজেই ভিন্ন কায়দায় একই স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করা হয়েছে নানান পুরস্কার, হেন তেন ডিগ্রি আরো বাহারি কত কিছু ... ... !

তৃতীয় বিশ্বের লোকজন বিশেষত: গণবিরোধী শাসকগোষ্ঠি অত্যন্ত হীনমন্যতায় ভুগে। বিদেশের প্রশংসা, পুরস্কার ও ডিগ্রি অর্জনের জন্য স্বার্থবাজ চেলা চামুন্ডারা জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে এতটুকু দ্বিধা করে না। নিজেদের ব্যর্থতা ও অক্ষমতা ঢাকার জন্য তারা পশ্চাৎপদ সমাজের হীনমন্যতাবোধকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক লবিং করে পুরস্কার ও ডিগ্রি জুটিয়ে নেয়। অনেক সাধারণ জনগণ বিদেশী পুরস্কার ও ডিগ্রির বাহার দেখে সরকার প্রশাসনের অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে ন্যায্য সংগ্রাম করার কথা ভুলে যায়। শাসক গোষ্ঠি চায়ও এটা।

নিজেদের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে এবং জনগণকে ধোঁকা দেবার ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে শাসকগোষ্ঠী এধরনের নির্লজ্জ কাজ করে থাকে। সাময়িক কালের জন্য তারা স্বার্থসিদ্ধি করতে পারলেও এক পর্যায়ে জনগণ তাদের চালাকি ধরে ফেলে তাদেরকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে। স্বৈরশাসক এরশাদও শাসন ক্ষমতায় দীর্ঘকাল থাকার ব্যর্থ অভিলাষে অনেক কিছুই করেছিলেন। একেবারে পতনের আগ মুর্হূতেও এরশাদ থেমে থাকেননি। ফাষ্টলেডি রওশন এরশাদের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ক একটা ডিগ্রি পাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাজার অর্থনীতিতে সবই পণ্য হয়ে পড়েছে। বিদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় তৃতীয় বিশ্বের হীনমন্যতায় ভুগা শাসকদের কাছে ডিগ্রি বিক্রি করে অন্ন সংস্থান করছে, সে খবরও আজ আর কোন গোপন ব্যাপার নয়। পুরস্কার ও ডিগ্রির শেকলে শাসকগোষ্ঠীকে বেঁধে রেখে দেশের সম্পদ ও ব্যবসা হাতিয়ে নেয়ার জন্য বড় বড় আন্তর্জাতিক কোম্পানীগুলো নীতি-নৈতিকতার ধার না ধেরে অনেক গহির্ত কাজ করে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন করে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে পড়েছে। আন্তর্জাতিক পুরস্কার ডিগ্রিগুলো যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও ব্যাবসায়িক স্বার্থে দেয়া হচ্ছে, তা এখন সাধারণ মানুষের বুঝতে সুবিধে হবে। এতদিন তাদের কাছে ঐ সমস্ত পুরস্কার ও ডিগ্রিগুলো বিরাট কিছু মনে হতো। এখন তারা দেখতে পাচ্ছে, সবই ফাঁকি। পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্ভাবনাময় তেল-গ্যাস ও অন্যান্য সম্পদ হাতিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কোম্পনীগুলো যে লবিং করেছে, তার ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চুক্তি হয়েছে। তার ভিত্তিতে শেখ হাসিনাকে পুরস্কার ডিগ্রি দেয়া হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক দেখাতে পারলে ক্ষমতাসীন সরকারের লাভ আর কোম্পানীগুলোরও লাভ। কাজেই প্রধানমন্ত্রী হাসিনার জন্য আরো দশটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ও পুরস্কার জুটিয়ে দিতে অসুবিধা কোথায়? এসব তো আর পানিতে পড়ছে না ! বিনিময়ে ব্যাবসা ও তেল-গ্যাস অনুসন্ধান-আহরণের ক্ষেত্রে তো সুযোগ প্রসারিত হচ্ছে।

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে প্রত্যাগত ৫০ হাজার শরনার্থী বেদখলকৃত জায়গাজমি ফিরে পাচ্ছে না, আভ্যন্তরীন শরনার্থীরা নিজ জায়গায় যেতে পারছে না, আত্মসমর্পন করা জন সংহতি সমিতির সদস্যরাও প্রতিশ্রুতি অনুসারে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না, পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিচালিত হত্যাযজ্ঞের বিচার হলো না, অন্যায়ভাবে আটককৃত বন্দীরা মুক্তি পাচ্ছে না, পার্বত্য চট্টগ্রামে এক অরাজক অবস্থা চলছে, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, সেনাবাহিনী আগের মতো সাধারণ জনগণের উপর জোর জবরদস্তি করছে ... ... এতো সব অবস্থা বিরাজ করা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন। সেই শান্তি প্রকৃতপক্ষে কাদের শান্তি এবং কাদের দূর্গতি তা এখন জনগণ বাস্তব ঘটনা থেকে বুঝার সুযোগ পেলো। কিসিঞ্জার সাহেবদেরকে ধন্যবাদ দিতে হয়, নিজেরা লাভের ফসল তুলতে গিয়ে ডিগ্রি পুরস্কারের "চিচিম ফাঁকের" ভেল্কিটাও জনগণের কাছে ফাঁস করে ফেলেছেন। প্রধানমন্ত্রী হাসিনার যেভাবে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের (এস. এস. সি. ও এইচ. এস. সি. পরীক্ষার নকল সেন্টার?) ডিগ্রির বহর বাড়ছে আর পুরস্কার জুটছে—এভাবে আরো কিছুদিন চলতে থাকলে দেশ ও জনগণের বারটা বেজে যাবে। *৮ এপ্রিল '৯৯* ❑

হিল উইমেন্স ফেডারেশন কর্তৃক আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

স্বাধিকার বার্তা ॥ ৮ মার্চ হিল উইমেন্স ফেডারেশন কর্তৃক ঢাকায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। কবিতা চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি দীপায়ন খীসা, ঢাকা শাখার সভাপতি প্রমেশ্বর চাকমা ও মিঠুন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সমারী চাকমা, দপ্তর সম্পাদক ইলিরা দেওয়ান ও ঢাকা শাখার সাধারণ সম্পাদক মেকী খীসা।

বক্তারা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের চেলাচামুণ্ডারা চুক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হবে বলে গালভরা প্রতিশ্রুতি দিলেও, ঐ অঞ্চলে শান্তি, আশা তো দুরের কথা, বর্তমানে লোকজনকে সরকার সেনাবাহিনীর সহায়তায় সন্ত্র চক্র সন্ত্রাসের হাতে জিম্মি করে রেখেছে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে মগের মুল্লুক বানিয়েছে।

শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, সারা দেশে এখন এক নৈরাজ্যিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মূলত: স্বৈরাচারী এরশাদ ও খালেদা সরকারের সাথে বর্তমান সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বর্তমান সরকার মুখে আইনের শাসন ও ন্যায় বিচারের কথা বললেও কল্পনা চাকমার অপহরণকারীদের বিচার ও শাস্তি দিতে পারেনি। যে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল তার রিপোর্ট আজ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। বক্তারা এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, একমাত্র পূর্ণস্বায়ত্ত-শাসন প্রদানের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি ও নারী অধিকার অর্জন সম্ভব হবে। ❑

সন্তু লারমার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা মামলার রায়

গতকাল জেএসএস প্রধান সন্তু লারমার বিরুদ্ধে আনীত জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার মামলার রায় ঘোষিত হয়েছে। দীর্ঘ এক বছরেরও অধিক সময় শুনানীর পর দেশী-বিদেশী সাংবাদিক, কূটনীতিক মিশনের প্রতিনিধি ও দেশবরেণ্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এই রায় দেয়া হলো। এ সময় সমগ্র আদালত ছিল লোকে লোকারণ্য। বিজ্ঞ আদালত সন্তু লারমা ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হওয়ায় তাদেরকে "জাতীয় বিশ্বাসঘাতক" হিসেবে রায় দেন। রায় ঘোষণার সময় সন্তু লারমা ও অন্য আসামীগণও আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তবে অসুস্থতার জন্য তাদের একজন জেত্তুয়া চাকমা উপস্থিত থাকতে পারে নি। ঐ সময় সন্তু লারমাকে বিষণ্ন, হতাশাক্লিষ্ট ও এক কথায় *"বেজা নয়েয়্যা ছাগল-অ মু"* দেখাচ্ছিল। উল্লেখ্য, গত ২ ডিসেম্বর '৯৭ চুক্তি ও ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ আত্মসমর্পনের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের দেশপ্রেমিক ও মুক্তিকামী জনগণ বাদী হয়ে 'জনতার বিবেক' আদালতে এক রিট আবেদন পেশ করলে সন্তু লারমা ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে উক্ত মামলার শুনানী শুরু হয়। বাদী ও বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীগণ পক্ষে ও বিপক্ষে তাদের নিজ নিজ বক্তব্য, যুক্তি ও মতামত ব্যক্ত করেন। আদালত মোট সাড়ে ছয় লক্ষ জনের সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রহণ করেন।

এই মামলা দেশে বিদেশে ব্যাপক আলোড়ন ও আগ্রহের সৃষ্টি করে। জাতীয় দৈনিকসমূহ গুরুত্বসহকারে শুনানীর প্রতিবেদন প্রকাশ করে। রায় ঘোষণার পর বাদী পক্ষের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে দেশপ্রেমিকগণ বলেন, "আমরা খুব আনন্দিত। এই রায়ের ফলে জনগণের আন্দোলনকামী দেশপ্রেমিক শক্তির বিজয় সূচিত হয়েছে। জনগণ বিশ্বাসঘাতকদের জনতার প্রত্যাখ্যান করেছে। জনতার বিবেক অত্যন্ত সঠিক রায় দিয়েছে। জনতার রায় কখনো ভুল হতে পারে না"। পর্যবেক্ষকগণ এই রায়কে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেছেন এবং বলেন ইতিহাসে এটি একটি নজির হিসেবে থাকবে। আমরা জনগণের মধ্যে আগ্রহ লক্ষ্য করে মামলার রায়টি নিম্নে স্বাধিকার পাঠকদের জন্য সংক্ষিপ্তাকারে মুদ্রণ করলাম ঃ

In the "Supreme Court of People's Conscience"
(Original Writ Jurisdiction)
and
in the Matter of
Patriotic and Freedom loving Peoples ..... the petitioner
(বাদী পক্ষ)
and
Santu Larma & his accomplices ..... the respondents. (বিবাদী পক্ষ)

Judgement (রায়) ঃ

জনসংহতি সমিতি কর্তৃক আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে আপোষ চুক্তি ও আত্মসমর্পন এবং জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থি কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংগ্রামী ও দেশপ্রেমিক জনগণ সন্তু লারমা ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে Supreme Court of Peoples Conscience অর্থাৎ জনতার আদালতে একটি Writ আবেদন পেশ করেন। এতে বাদীপক্ষ যেসব অভিযোগ উত্থাপন করেন তা নিম্নরূপ :

সন্তুচক্রের অপরাধসমূহ :

১. *নিজেদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ চরিতার্থ করার হীন উদ্দেশ্যে **জুম্ম জনগণকে দ্বিখণ্ডিত করা।***
২. *সুমহান জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে আপোষ চুক্তি সম্পন্ন করা।*
৩. *সরকারের নিকট আত্মসমর্পনের মাধ্যমে জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা।*
৪. ***দুইনাম্বারী সৃষ্টি করে দিয়ে** পাহাড়ী গণ পরিষদ ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদকে দ্বিখণ্ডিত করা ও এই সংগঠনগুলোর কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা।*
৫. *সকল ধরনের নিকৃষ্ট দালাল, দুলা তথা **প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে** সমাজে ও রাজনৈতিক অঙ্গণে **সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন** করা।*
৬. *ধুদুক ছড়ায় ১৫ জুন ১৯৯৫ **"জঙ্গী আন্দোলন করা যাবেনা"** বলে ঘোষণা দিয়ে জনগণের দুর্বার আন্দোলনকে সরকারী এজেন্ট হয়ে স্তব্ধ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র।*
৭. *চুক্তি ও আত্মসমর্পনের পূর্বে জনগণের আন্দোলনকে বানচাল করে দেয়ার উদ্দেশ্যে **তিন সংগঠনের নেতাকর্মিদের ওপর হামলা, শারিরীক অত্যাচার ও হুমকি ধামকি দেয়া।***
৮. *আত্মসমর্পনের পূর্বে কাউখালীর পানছড়ি নামক গ্রামে **জনগণের ওপর সেনাবাহিনী কায়দায় আক্রমণ** চালিয়ে অনেককে আহত ও পঙ্গু করা।*
৯. *চুক্তির পর তিন সংগঠনের নেতাকর্মিদের ওপর সেনাবাহিনী ও পলিশের সহায়তায় নির্বিচার হামলা চালানো এবং **স্পাই-এর ভূমিকা গ্রহণ।** ৩৫ জন নেতাকর্মিকে দুই নাম্বারীদের দিয়ে ধরপাকড় ও পুলিশের হাতে হস্তান্তর করা।*
১০. *চিহ্নিত অপরাধী দাগী আসামী মুখোশবাহিনী ও সকল ধরনের **ষণ্ডা গুণ্ডাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় ও মদদ দান** ও তাদেরকে তিন সংগঠনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া।*
১১. *উঠতি তরুণ **যুব সমাজকে মদ, জুয়া, ফেনসিডিল, গাঁজা ও হিরোইনে আসক্ত করে রেখে** সমাজ জাতিকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়ার সুগভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা।*
১২. *জনগণের মাঝে **হতাশা ও নৈরাশ্য ছড়িয়ে** জাতির সংগ্রামী উদ্যমকে নিঃশেষ করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা।*
১৩. *৪ এপ্রিল ১৯৯৮ পানছড়িতে পাহাড়ী গণ পরিষদ ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতা প্রদীপ লাল চাকমা ও কুসুম প্রিয় চাকমাকে **প্রকাশ্য দিবালোকে বর্বরভাবে খুন** করা।*
১৪. *সম্প্রতি মাইসছড়ির হরেন্দ্র ও হুরুক্যা এবং দিঘীনালায় মৃনাল, আনন্দ ময় ও বীর লাল দেওয়ানকে "দুই নাম্বারীদের দিয়ে খুন করা।"*

বাদীপক্ষ তাদের আরজিতে আরো বলেন, "এক সময় আন্দোলনে প্রগতিশীল ভূমিকা রাখলেও সন্তু লারমা চক্র বর্তমানে প্রতিক্রিয়ার দুর্গ হিসেবে কাজ করছে। তারা এখন আদর্শিকভাবে বিচ্যুত ও রাজনৈতিকভাবে অধঃপতিত। সুবিধাবাদই হচ্ছে তাদের পরম আদর্শ। সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে পরিস্থিতি ঘোলাটে করে সুবিধা হাসিলই হচ্ছে তাদের রণনীতি এবং ভন্ডামী ও লেজুরবৃত্তিই হচ্ছে তাদের রণকৌশল। ফলত: সন্তুচক্রের কার্যকলাপ আন্দোলনের অখণ্ডতা ও জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতির এই চরম দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে দেশপ্রেমিক ও সংগ্রামী জনগণের পক্ষ থেকে মহামান্য আদালতের নিকট আমাদের আকুল আবেদন—

(ক) সন্তু লারমা চক্রকে "জাতীয় বেঈমান", "জাতীয় বিশ্বাসঘাতক", "খুনী" ও "আদম ব্যাপারী" বলে ঘোষণা দেয়া হোক ; এবং

(খ) সন্তু লারমা চক্রের দ্বারা পরিচালিত জনসংহতি সমিতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং তাদের জাতীয় স্বার্থ বিরোধী সকল কার্যকলাপ বন্ধ করে দেয়া হোক।

আমরা অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের দেশপ্রেমিক ও সংগ্রামী জনগণ মনে করি, সন্তু লারমা চক্রের বিরুদ্ধে উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই কেবল জাতিকে দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে, আন্দোলনের পথ প্রশস্ত হবে এবং সমগ্র জাতি ও জনগণকে নতুনভাবে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে। আমরা আশা করি, এই যুগসন্ধিক্ষণে Court of Peoples Conscience অর্থাৎ "জনতার বিবেকের আদালত" উপরোক্ত প্রতিকার বিধানের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবে।"

মহামান্য আদালত দেশপ্রেমিক জনগণের উপরে উল্লেখিত রিট আবেদন গ্রহণ করে, এবং কেন সন্তু লারমা চক্রকে "জাতীয় বিশ্বাসঘাতক" "খুনী" ও "আদম ব্যাপারী" সাব্যস্ত করা হবেনা—এই মর্মে একটি রুলনিশি অর্থাৎ নোটিশ জারি করে। ঐ নোটিশের জবাব দেয়ার জন্য আদালত সন্তু লারমা চক্র ও জেএসএস-কে এক মাস সময় দেয়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে জবাব দানে ব্যর্থ হলে কোর্ট মামলার শুনানী শুরু করে।

শুনানী চলাকালে বাদী ও বিবাদী পক্ষের কৌশুলীগণের মধ্যে তুমুল বাক বিতণ্ডা শুরু হয়। উভয় পক্ষই যুক্তি পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করে, বিভিন্ন আইনের উদ্বৃতি দেয় এবং নজীর (Precedence) হিসেবে এ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক মামলার উল্লেখ করে।

বিবাদী পক্ষ অর্থাৎ সন্তু চক্রের আইনজীবী মোঃ বেআক্কেল তার বয়ানে বলেন, 'মহামান্য আদালত', আমার নাম বে আক্কেল, আমার মক্কেল সন্তু লারমাকে "জাতীয় বিশ্বাসঘাতক" বলা আইন সঙ্গত নয়। কেননা, ১৯০৫ সালের বিশ্বাসঘাতক আইনের ২(চ) ধারায় বলা হয়েছে, বিশ্বাসঘাতক বলতে তাকেই বোঝাবে যিনি তাঁর ওপর ন্যস্ত বিশ্বাসকে হত্যা করেছেন। একই আইনের ৩২ (৩) ধারায় আরো বলা আছে যে, তিনি কি দিয়ে অথবা কিভাবে ঐ বিশ্বাসকে হত্যা করেছেন সেটা দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় নয়। কাজেই দেখা যায়, এ সংজ্ঞা অনুসারে সন্তু লারমা বিশ্বাসঘাতক নন। কারণ তার ওপর কেহ বিশ্বাস জমা রাখে নাই। তিনি কারোর গোলামও নন। তাছাড়া তিনি হত্যা করবেন কিভাবে? তিনিতো সব অস্ত্র সরকারের কাছে জমা দিয়াছেন।

বিবাদী পক্ষের এই যুক্তি খণ্ডন করে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন, বেআক্কেল সাহেবের উক্ত আইনের ব্যাখ্যা ঠিক নয়। কারণ সন্তু লারমা আন্দোলন শুরু করার সময় এবং সংগ্রাম চলাকালে বার বার অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি ও তার চক্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে El dorado বা সব পেয়েছির দেশ বানিয়ে দেবেন। তার এই কথায় জনগণ বিশ্বাস করে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। কিন্তু তিনি পরে জনগণকে ফাঁকি দিয়ে চুপিসারে সরকারের সাথে গোপন আঁতাত করেন। ইহা আইন অনুযায়ী বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজ এবং সেজন্য ইহা একটি গুরুতর অপরাধ।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বিশ্বাসঘাতক সম্পর্কে অতীতে যে সব মামলায় ঐতিহাসিক রায় দেয়া হয়েছে তারও উল্লেখ করেন। বিশেষতঃ তিনি রামায়ণের রাবণ রাজ বনাম ঘরশত্রু বিভীষণ, বাংলার জনগণ বনাম মীর জাফর, স্পেনের জনগণ বনাম পঞ্চম বাহিনী ও নরয়েরের জনগণ বনাম কুইসলিং মামলার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেন এবং এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে এই সব মামলাগুলোর সাথে "পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ বনাম সন্তু লারমা চক্রের" মামলার মধ্যে হুবহু মিল রয়েছে। সুতরাং বিভীষণ, মীরজাফর ও কুইসলিং-কে যেভাবে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে ইতিহাসে রায় দেয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে সন্তু লারমা চক্রকেও জাতীয় বিশ্বাসঘাতক হিসেবে সাব্যস্ত করা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং আন্দোলন সংগ্রামে প্রচলিত আইন মোতাবেক সিদ্ধও বটে।

এরপর এডভোকেট বেআক্কেল "আদম ব্যাপারীর" সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করে বলেন সন্তু লারমাকে আদম ব্যাপারী বলাও আইন সঙ্গত নয়। কেননা এতে তার মানহানি ঘটে। আমার মক্কেল সন্তু লারমা একজন অত্যন্ত সম্মানীত ও সমাজে উঁচুদরের লোক। তিনি সরকারের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ও অনুগত এবং তিনি সরকারের কাছ থেকে অনেক সুবিধা পেয়ে থাকেন। মন্ত্রীত্বও তার হাতের মুঠোই। সুতরাং যারা তাকে আদম ব্যাপারী বলে ডাকেন তারা তার ওপর রাজনৈতিক ঈর্ষা বশতঃই তা করে থাকেন।

এর জবাবে বাদী পক্ষের কৌশুলী "দালাল প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৯ (সংশোধিত)" -এর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই আইনের ৩ (ঞ) ধারায় আদম ব্যাপারীর যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ: "আদম ব্যাপারী বলিতে তাহাকেই বুঝাইবে যিনি অন্য কোন ব্যক্তিকে নানা ধরনের লোভ দেখাইয়া নিয়া গিয়া তৃতীয় জনের নিকট তাহাকে বিক্রয় করিয়া দেন। তবে শর্ত থাকে যে, এই ক্ষেত্রে বিক্রয়কারীকে অবশ্যই ক্রেতা এবং বিক্রিত ব্যক্তি উভয়ের নিকট হইতে অর্থ বা অন্য কোন সুবিধা পাইতে হইবে।"

বাদী পক্ষের কৌশুলী এই দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সন্তু লারমা এই সংজ্ঞার মধ্যে পড়েন। কারণ, তিনি স্বায়ত্তশাসন ও অধিকারের কথা বলে বহু নিরীহ লোকজনকে তার প্রাইভেট কোম্পানীতে ভিড়াইয়া নেন এবং পরে মন্ত্রীত্ব ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে সরকারের নিকট তাদেরকে তুলে দেন। সন্তু লারমা ঐসব লোকজনের কাছ থেকেও মাথাপিছু ১০ হাজার টাকা আদায় করেন। এতে তিনি অত্যন্ত সফল ব্যবসা করেন। কাজেই উক্ত সংজ্ঞা অনুসারে সন্তু লারমাকে আদম ব্যাপারী হিসেবে অভিহিত করা আইনসঙ্গত।

এরপর মোঃ বেআক্কেল দাবি করেন যে, তার মক্কেল সন্তু লারমা বহু বছর ধরে সংগ্রাম করেছেন, তিনি জেল খেটেছেন এবং বহু ত্যাগ তিতিক্ষা করেছেন। সুতরাং, মন্ত্রীত্ব ও অন্যান্য সরকারী সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করা ন্যায় সঙ্গত। আর অন্যদিকে "বাস্তবতার" কারণেই তাকে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিহার করতে হয়েছে। তিনি বহু বছর অভিজ্ঞতার আলোকে এই তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন যে, বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে লেজুরবৃত্তি কৌশল অবলম্বন করেও অধিকার আদায় সম্ভব।

এর প্রতিউত্তরে বাদী পক্ষের আইনজীবী বলেন, সুবিধাবাদী কার্যকলাপ নিরোধক আইন অনুসারে "বাস্তবতা ও কৌশলের দোহাই দিয়ে অর্পিত জাতীয় দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে সুবিধাবাদ এবং সেজন্য এটি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সন্তু লারমা চক্রও নিজেদের সুবিধাবাদকে "বাস্তবতা ও কৌশল" বলে চালিয়ে দিতে চাচ্ছেন। কিন্তু আন্দোলন সংগ্রামের আইনে তিনি ধরা পড়েছেন।

বিজ্ঞ আদালত বাদী ও বিবাদী পক্ষের আইনজীবীগণের বক্তব্য শ্রবণ ছাড়াও সাড়ে ছয় লক্ষ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে। এই সাক্ষীগণের মধ্যে ছয় লক্ষ ছয়চল্লিশ হাজার সাত শত ষাটষট্টি জন সন্তু চক্রের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন, ২৩৩ জন নিরপেক্ষ ছিলেন এবং বাকী ৩ হাজার সন্তু লারমার পক্ষে সাক্ষ্য দেন। পক্ষে বিপক্ষের বক্তব্য ও সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণের পর বিজ্ঞ আদালত মনে করে যে, বাদী পক্ষ সন্দেহাতীতভাবে (beyond reasonable doubt) সন্তু লারমা চক্রের বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

সেজন্য মহামান্য আদালত সন্তু লারমা চক্রকে "জাতীয় বেঈমান", "খুনী" ও "আদম ব্যাপারী" বলে সাব্যস্ত করছে। এখন থেকে জুম্ম জাতির ইতিহাসে তারা এই বিশেষণে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন।

জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ও ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথ সুগম করার লক্ষ্যে আদালত সন্তু চক্র তথা জনসংহতি সমিতির সকল কার্যক্রমকেও বেআইনী ও অবৈধ হিসেবে ঘোষণা করছে। এখন থেকে সন্তুচক্র পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন এলাকায় সভা সমাবেশ মিটিং মিছিল করতে পারবে না। অর্থাৎ জনসংহতি সমিতি বেআইনী ঘোষিত হল। জনতার আদালত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে এই রায় কার্যকর করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছে।

Supreme Court of Peoples Conscience -এর এই রায় চূড়ান্ত (final) বলে বিবেচিত হবে এবং এর বিরুদ্ধে কোন প্রকার আপিল চলিবে না। কারণ জনতার এই আদালতই হচ্ছে সর্বোচ্চ আদালত। ❑

২১ ফেব্রুয়ারীতে সেনা-পুলিশ অভিযান

'৫২ এর ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে সারা দেশে যেখানে শহীদ দিবস পালিত হয়, দিবসটি সরকারী ছুটি হিসেবে থাকে। কিন্তু তার বিপরীতে খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষীছড়ি থানা সদরে শহীদ দিবসের মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিনে সেনা-পুলিশ পাহাড়ী অধ্যুষিত গ্রামে অভিযান চালিয়ে সাধারণ জনগণকে ভীত সন্ত্রস্থ করে রেখেছে। ঘটনার দিন ইউপিডিএফ-এর নেতৃত্বাধীন PGP-PCP-HWF -এর নেতৃবৃন্দ লক্ষীছড়ি বাজারের সন্নিকটস্থ এক পাড়ায় শহীদদের স্মরণে আলোচনা সভা আহ্বান করেছিল। ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারেও ইউপিডিএফ শহীদদের সম্মানে পূষ্পস্তবক অর্পন করে, সে সংবাদ জাতীয় পত্র-পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারী শহীদ স্মরণ সভায় এভাবে সেনা-পুলিশের হামলায় জনতা হতচকিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই জনমনে এখন প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, সেনা ও পুলিশ কি উদ্দেশ্যে এ ধরনের কাজ করছে? ইউপিডিএফ-এর নেতৃত্বাধীন PGP-PCP-HWF ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করুক এটাই কি সেনা বাহিনীর বিশেষ গোষ্ঠি চায়? কেন ইউপিডিএফ ও এর নেতৃত্বাধীন PGP-PCP-HWF কে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সভা সমাবেশ করতে বাধা দেয়া হচ্ছে? ইউপিডিএফ কোন পন্থায় আন্দোলন করলে সেনাবাহিনীর বিশেষ গোষ্ঠিটির মনোবাসনা পূর্ণ হবে? অভিজ্ঞমহল এমন সন্দেহও প্রকাশ করছেন যে, ইউপিডিএফ-কে নিয়মতান্ত্রিক পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে সেনাবাহিনীর বিশেষ গোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে থাকার অজুহাত সৃষ্টি করতে চায়। এতে স্বার্থবাদী দূর্নীতিবাজ সেনা অফিসারদের "স্বাধীনতা" "সার্বভৌমত্ব" রক্ষার উছিলায় কাঠ ব্যবসা করতে ও বিভিন্ন প্রজেক্ট থেকে মোটা অংক হাতিয়ে নিয়ে আখের গুছাতে সুবিধে হয়। গুলশান,বনানী ও বারিধারার মতো ধনাঢ্য এলাকায় অনেক সেনা অফিসারের বাড়ী রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে পোষ্টিংয়ে থাকলে আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো কতিপয় সেনা অফিসারের এভাবে রাতারাতি অভিজাত এলাকায় গাড়ী-বাড়ী করতে সুবিধে হয়। তবে, অনেক নিষ্ঠাবান অফিসার তা করতে পারে না। আর সাধারণ সিপাইরা পার্বত্য চট্টগ্রামে অতিরিক্ত ডিউটি করার ফলে এবং ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে আয়ু অর্ধেক ক্ষয় করে ফিরে আসতে বাধ্য হয় বলেও অনেক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মন্তব্য করেন।

শহীদ দিবসের দিনে লক্ষীছড়িতে আহুত শহীদ স্মরণ সভায় হামলাকারী সেনা ও পুলিশের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা তা এখনো জানা যায়নি।

কাট্টলীতে আর্মড পুলিশের চাঁদাবাজি

রাঙ্গামাটির লংগুদু থানাধীন কাট্টলী এলাকাতে আর্মড পুলিশের সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরে অন্যায় জোর জবরদস্তি করে নিরীহ কাঠুরিয়াদের কাছ থেকে চাঁদা উঠাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কাট্টলী এলাকায় সাধারণ লোকজনের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। গাছ বাঁশ বিক্রি করেই লোকজন জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হচ্ছে। লোকজনকে গভীর বনজঙ্গল থেকে গাছ-বাঁশ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করতে হয়। মাঝপথে আর্মড পুলিশের সদস্যরা ভয় ভীতি দেখিয়ে নিরীহ কাঠুরিয়াদের কাছ থেকে বলপূর্বক চাঁদা আদায় করে নেয় বলে ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেছেন। সুবলং ফরেস্ট অফিস আরো এক দূর্নীতি ও শোষণের আখড়া। এখানে সাধারণ কাঠুরিয়াদেরকে নানাভাবে হয়রানি হতে হয়। নিজের মালিকানাধীন বাগান-বাগিচা থেকে গাছ-বাঁশ কাটলেও ফরেস্ট অফিসকে মোটা অংকের চাঁদা দিতে হয়। আর্মড পুলিশ সদস্যদের দূর্নীতি আর ফরেস্ট অফিসের বাড়াবাড়ির ফলে কাট্টলীতে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের নাভিঃশ্বাস উঠার উপক্রম হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কাপ্তাই বাঁধের ফলে এই অঞ্চলের লোকরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। চাষযোগ্য জমি ডুবে যাবার ফলে লোকজন নিঃস্ব হয়ে পড়ে। চাষবাস করে জীবিকা অর্জনের কোন অবস্থা তাদের নেই। কাপ্তাই বাঁধ দেবার সময় তৎকালিন পাকিস্তান সরকার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়নি। ফলে মানুষের দুর্ভোগের সীমা নেই। যে কিছু চাষযোগ্য জমি ডুবে যায়নি, সে সব বহিরাগতরা বেদখল করে আছে। গাছ-বাঁশ কাটার ক্ষেত্রেও বেআইনী বহিরাগতরা ভাগ বসায়। তাদের সাথে প্রতিযোগীতা করেই পাহাড়ীদেরকে জীবিকা ও অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

"পার্বত্য চুক্তি" কাট্টলী এলাকায় তথা সারা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জন্য আশাব্যঞ্জক কোন কিছু বয়ে আনতে পারেনি। সাধারণ নিঃস্ব খেটে খাওয়া মানুষের দুর্ভোগ দিন দিন চরমে উঠছে। সাধারণ লোকজন প্রশ্ন করতে শুরু করেছে, "এ কোন দেশে, কোন মুল্লুকে বাস করছি ! কোন সমাজে আছি !! অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো মৌলিক বঞ্চিত। দু'মুঠো অন্ন সংস্থানের সুযোগটুকু পর্যন্ত আমরা পাচ্ছি না। অথচ ক্ষমতাসীন সরকার নিজেকে গণতান্ত্রিক ও জনগণের নির্বাচিত সরকার বলে জাহির করতে চায়। বাংলাদেশের গণতন্ত্র আলাদা জগৎ থেকে আনা হয়েছে নাকি...।" এ ধরনের মন্তব্য জনগণ করছে। জনমনে অন্যায় শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমস্ত অনাচারের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করেই জনতার অধিকার ছিনিয়ে আনতে হবে। দিন দিন এই উপলব্ধি তীব্রতর হচ্ছে।

এখানে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কাট্টলীস্থ আর্মড পুলিশ সদস্যরা বারবুনিয়ার ২য় আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

পানছড়ির বড়কলক গ্রামে সেনা হামলা

২১ মার্চ ভোর রাতে ৩:৩০ টায় পানছড়ি সেনা অধিনায়কের নেতৃত্বে সেনা ও পুলিশ বাহিনী যৌথভাবে বড়কলক গ্রামে PGP-PCP-HWF দপ্তর ঘেরাও করে। তাদের সাথে মুখোশ পরা অবস্থায় দু'তিন জন জনসংহতি সমিতির লেজুর দুই নাম্বারী স্পাই ছিলো। সেনা ও পুলিশ অভিযানের সময় দপ্তরে তিন সংগঠনের কোন নেতা কর্মী ছিলেন না।

পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের কোন নেতা কর্মীকে না পেয়ে সেনা ও পুলিশের সদস্যরা পাড়ার সাধারণ লোকজনকে খোলা মাঠে জড়ো করে। কালো প্রিয় চাকমার ছোট ভাই শান্তি প্রিয় চাকমা (১৭), পিতা : মদন চন্দ্র চাকমা ও কালা মরত্ত্য চাকমাকে (৩৫) পিছ মোড়া করে বেঁধে ফেলে। এক পর্যায়ে কালা মরত্ত্য'কে সেনা জওয়ানরা বেদম মারধর করে। পাড়ার আরো দু'টি বাড়ীতে তল্লাশী ও লুটপাট চালায়।

কালা মরত্ত্য চাকমার বাড়ীতে স্যুটকেস খুলে ৬৭০ টাকাও সেনা ও পুলিশ সদস্যরা হাতিয়ে নেয়। তিন সংগঠনের কর্মীদের ব্যবহৃত কাপড়-চোপর পর্যন্ত নিয়ে যেতে তাদের এতটুকু বাধেনি। পুলিশ ও সেনা জওয়ানরা সংগঠনের একটি এলবাম এবং একটি ভলিবলও নিয়ে যায়। অপারেশন শেষে ফিরে যাবার প্রাক্কালে তারা নবজ্যোতি চাকমা বড় ছেলে উদ্দীমান চাকমাকে (১২) সাংঘাতিকভাবে মারপিট করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা খবরদারী কি পরিমাণে বজায় রয়েছে, তা সেনাবাহিনী এভাবে প্রমাণ দিয়ে চলেছে।

ক্যজয় মারমার তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

স্বাধিকার বার্তা ॥ গত ৩১ মার্চ ১৯৯৯ খাগড়াছড়িতে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ ক্যজয় মারমার তৃতীয় মৃত্যুবাষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে পানখাইয়া পাড়ায় তার স্মরণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পন এবং সকালে সারিপুত্র পালিটোল ক্যায়ং-এ "বার্ষিক ক্রিয়া ভোজ"-এর আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় হাজার প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ফানুস বাতি ওড়ানো হয়।

সকালে স্মৃতিস্তম্ভে যে সব সংগঠন পুষ্পমাল্য অর্পন করে সেগুলো হলো, মারমা উন্নয়ন সংসদ, পানখাইয়া পাড়া, পাহাড়ে ঝর্ণা ক্লাব, আপার পেরাছড়া, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, খাগড়াছড়ি জেলা শাখা, নিংরং লাইব্রেরী, আরং ক্লাব, ওয়াম্মা ক্লাব, আদর্শ কৃষক সমিতি লিঃ পানখাইয়া পাড়া। চট্টগ্রাম টাউনেও তিন সংগঠনের উদ্যোগে ক্যজয় মারমার মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের একনিষ্ঠ কর্মি ক্যজয় মারমা ১৯৯৬ সালের ৩১শে মার্চ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের গুলিতে নিহত হন।

বাঘাইহাটে সংঘর্ষ আর্মীদের হামলা, আহত ২৬

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি ॥ গত ৪ এপ্রিল ১৯৯৯ দিঘীনালা থানাধীন বাঘাইহাটে একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে সংঘটিত সংঘর্ষে ২৬ ব্যক্তি আহত হয়েছেন। এর মধ্যে ৩ জন সেনাবাহিনীর সদস্য বলে জানা গেছে। গুরুতর আহতদের মধ্যে ৮ জনকে দিঘীনালা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া দু'জন এখনো নিখোঁজ রয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জানা গেছে ঐ দিন ছিল হাটবার। একজন পাহাড়ী মেয়ে কাপড় সেলাই করতে একটি বাঙালী দোকানে গেলে দোকানদার তার সাথে অশোভন আচরণ করে। লোকজন এতে ক্ষুব্ধ হয়। বচসার এক পর্যায়ে ঘটনাটি পাহাড়ী বাঙালী সংঘর্ষের রূপ নেয়। ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলে। পরে নিকটস্থ ক্যাম্প থেকে আর্মীরা এই মারামারিতে যোগ দেয় এবং পাহাড়ীদেরকে ধরে ধরে মারপিট করতে শুরু করে। প্রকাশ, বাঘাইহাটের একটি বিশেষ মহল দীর্ঘদিন ধরে দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা চালাচ্ছিল।

একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে খাগড়াছড়িতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি ॥ একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে খাগড়াছড়ি সদরের মিলনপুর ও কল্যাণপুর এলাকায় পাহাড়ী-বাঙালী সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। গত ২৭ মার্চ এ ঘটনা ঘটে। ঐদিন রাত ৯টার দিকে মিলনপুরে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে মদ্যপানের পর কয়েকজন বখাটে পাহাড়ী ছেলে কল্যাণপুর রাস্তায় আড্ডা দিতে যায়। তাদের ভাষ্যমতে, মিন্টু দে নামের একজন ব্যবসায়ী ও যুবলীগ কর্মি এসময় তাদেরকে রাস্তায় ধাক্কা দিলে ছেলেরা তাকে মারধর করে ছেড়ে দেয়। ছাড়া পাওয়ার পর মিন্টু দে জাহেদুল আলমের কাছে গিয়ে ঘটনার কথা বর্ণনা করে এবং প্রতিশোধ নেয়ার জন্য রফিকসহ ১৫/২০ জনের মতো বাঙালী ছেলে তৎক্ষণাৎ ঘটনা স্থলে যায়। তারা পিস্তল উঁচিয়ে মিলনপুরের অক্কনা চাকমাকে (পীং প্রেম লাল চাকমা) ধরে নিয়ে আসে এবং সাংঘাতিকভাবে মারধর করার পর পুলিশের হাতে সোপর্দ করে। বখাটে পাহাড়ী ছেলেরা মিন্টু দে-এর কাছ থেকে টাকা পয়সা ছিনতাই করেছে বলে অভিযোগ করা হয়।

এদিকে অক্কনা চাকমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর পাহাড়ী ছেলেগুলো সুকুমার চাকমাসহ জাহেদুল আলমের বাসায় যায়। সেখানে জাহেদুল আলমের সাথে তাদের কথা কাটাকাটি হয়। ফেরার পথে ছেলেরা হাজী রফিকের বাসায় যায়, কিন্তু সে বাড়ীর গেট খুলে দেয়নি। বরং সেখানে বাঙালীরা দলবদ্ধ হয়ে তাদের ওপর আক্রমন চালালে ঐ ছেলেরা ফিরে আসতে বাধ্য হয়। অনেকে কল্যাণপুরে ঢুকে পড়ে পাহাড়ীদের বাড়ীঘরে হামলা চালায় এবং সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করে। যাদের বাড়ীঘরে হামলা চালানো হয়, তারা হলো ত্রিদিব চাকমা, অনিময় চাকমা, তপন রায় ও শ্রীলা তালুকদার, বান্দরবান সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। ঘটনার পর বাঙালীদের পক্ষ থেকে মামলা করা হয়, তবে গত ৪ এপ্রিল জাহেদুল আলম বাদী হয়ে অক্কনাকে জামিনে ছাড়িয়ে আনেন।

অপর এক ঘটনায়, ২৯ মার্চ মিলনপুর ব্রীজের গোড়ায় ও রেগা লাইব্রেরী মাঠে দু'টো ককটেল পাওয়া যায় বলে জানা গেছে। গ্রামবাসীরা থানায় খবর দিলে পুলিশ সেগুলো উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে কোন মামলা করা হয় নি বলে জানা গেছে।

"ট্যাক্স তুললে তো হবে না, ভাগ তো দিতে হবে ..."

-আর্মি সুবেদারের উক্তি

খিরাম ক্যাম্পের সুবেদার নজরুল সেনা অভিযান শেষে ২০ মার্চ দুপুর বর্মাছড়ি বাজারে আসা জনৈক ইউপি মেম্বারকে ডেকে ইউপি ডিএফ -এর নেতৃত্বাধীন গণ পরিষদ নেতা অনিল চাকমার বিরুদ্ধে অযৌক্তিক মর্যদাহানিকর কথাবার্তা বলে। জননেতা অনিল'কে ধরিয়ে দিতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরষ্কার দেবার কথাও ঘোষণা করে। নানান কথাবার্তার এক পর্যায়ে সুবেদার নজরুল ইউপি মেম্বারকে নিম্ন স্বরে বলে ফেলে "ট্যাক্স তুললে তো হবে না, ভাগ তো দিতে হবে। তাহলে আমরা আর আসবো না। ছাত্রলীগ ও তো আমাদের চাঁদা দেয়।" কথাটি বলে সুবেদার নজরুল সেনা জওয়ানদের নিয়ে বর্মাছড়ি বাজার ছেড়ে ক্যাম্পের দিকে রওনা দেয়। ইউপি মেম্বারের সাথে সুবেদারের কথাবার্তা বাজারে আসা এক ব্যক্তি শুনে ফেলে।

সুবেদার নজরুলের নেতৃত্বে পাড়া-গ্রামগুলোতে অহেতুক তল্লাশী ও ট্যাক্স দাবী নিয়ে বর্মাছড়ি এলাকায় জনমনে নানান প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সামান্য এক সুবেদার কিভাবে একটা রাজনৈতিক দলের নেতাকে ধরার জন্য পুরষ্কার ঘোষণা দিতে পারে। বেআইনী কোন কাজ করলে তো আইনগত ব্যবস্থা নেবার জন্য পুলিশ রয়েছে। পার্বত্য চুক্তি নিয়ে এতো হাঁকডাক হচ্ছে, সেনা ক্যাম্পগুলো কেন পাহাড়ী অধ্যুষিত এলাকা থেকে তুলে নেয়া হচ্ছে না। চুক্তির পরেও তো সেনা খবরদারি জোর জবরদস্তি কমেনি। তাহলে লোকে চুক্তি মানতে পারবে কি করে। প্রীতিগ্রুপ ও তো চুক্তি করেছিলো। জেলা পরিষদের সময়েও চুক্তি হয়েছিলো। তখনও তো জনগণ সেই চুক্তি মানেনি। সে সময় তো চুক্তি মানতে বাধ্য করা হয়নি। বর্তমান সরকারের আমলে জনগণের নাগরিক অধিকার খর্ব করা হচ্ছে কেন। চুক্তিতে অধিকার অর্জিত না হলে, জনতা আত্মঘাতি চুক্তি মানতে যাবে কোন দুঃখে ..... ইত্যাদি কথাবার্তা হাটে বাজারে আলোচিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, খিরাম ক্যাম্পটি ১৭ ইষ্ট বেঙ্গল ঘাগড়া সেনা জোনের অধীন।

আমরা দুঃখিত

স্বাধিকারের গত সংখ্যার (৯ম) শেষ পাতায় একটি ছবি ছাপানো হয়েছিল। সেখানে ভুল বশতঃ ইনসেটের ছবিগুলোর পরিচিতি দেয়া হয়নি। আসলে বামের ইনসেটে ছিল শহীদ হুরুক্যা ও ডানে হরেন্দ্র এর ছবি। এ ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

চট্টগ্রামে পিসিপি বন্দর শাখা কাউন্সিল সম্পন্ন

১৫ জানুয়ারী চট্টগ্রাম বুড্ডিষ্ট ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বন্দর থানা শাখার কাউন্সিল সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি দীপায়ন খীসা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভানেত্রী কবিতা চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

কাউন্সিল শেষে সহদেব চাকমাকে সভাপতি ও অমর জয় চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপি বন্দর থানা কমিটি গঠিত হয়েছে।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট-এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত